নির্বাচিত গল্প

উৎসর্গ

আবুল হাসনাতের স্মৃতির উদ্দেশে
শ্রদ্ধাসহ

কৈফিয়ত

সৃষ্টিশীল মাধ্যমে নিরঙ্কুশ পছন্দ বলে কিছু নেই। যদি দশজনকে একই জাতের চারটি জিনিস থেকে একটি বাছাইয়ের সুযোগ দেওয়া হয় আর প্রথমটি চারজনের, দ্বিতীয়টি তিনজনের, তৃতীয়টি দুজনের, চতুর্থটি একজনের অনুমোদন পায়, তাতে দাঁড়ায়, দশের অর্ধেক পাঁচ কোনো-একটি পছন্দ করেননি। তাই এই অনুমোদন যে সর্বমান্য তা বলার সুযোগ আর থাকে না। নির্বাচন তো এক ধন্দ। 'নির্বাচিত' সেই ধন্দেরই পরিণতি।

এখানে অবশ্য একটু বেশি স্বাধীনতা নেওয়া হয়েছে। যে সুযোগে এই সাতাশটি রচনা কয়েকজনের পরামর্শে নির্বাচনের গণ্ডি পেরিয়ে গায়ে সেঁটেছে 'নির্বাচিত'-র তকমা। কুড়ি-পঁচিশ বছর আগে কারো পড়া কোনো লেখা এখানে না থাকলে, তাঁর কিছু খেদ হতে পারে; তখন এগুলোর রচয়িতা নিরুপায়।

কয়েকজনের তৎপর সহযোগিতায় বেরোচ্ছে এই সংকলন। যাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধুতা, প্রীতি ও ভালোবাসার। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানানো বাহুল্য ঠেকে। তবু আহমাদ মোস্তফা কামাল, খোরশেদ আলম, মোস্তফা অভি, মনি হায়দার, মুহিত হাসান, আলমগীর হোসেন, আবিদ ফায়সাল, সফিক ইসলাম এবং কথাপ্রকাশের প্রকাশক জসিম উদ্দিন-কে ধন্যবাদ।

প্রশান্ত মৃধা

সূচি

মশারি	১১
কুহকবিভ্রম	১৮
বুড়ির গাছ	৫২
ভেজা দুপুর	৯১
শব্দ-নৈঃশব্দ্য	১০৭
গিঁট	১২৪
অন্ধ চাঁদ অথবা অন্ধকার	১৪৪
মেয়েটা বেঁচে যাবে	১৭১
উমা-পার্বতী সংবাদ	১৭৯
বাবার চিঠি	১৯৬
বইঠার টান	২০৭
একই নক্ষত্রের নিচে	২৬৭
এই যে নদী	২৭৭
নোনা হাওয়া	২৯২
কান্তারের পথ	৩০০
সাদা কৌপীন	৩৫২
যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী	৩৬০
সন্ধ্যামালতি	৩৮২
সোনার গোপাল	৪০৪
বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল	৪২৫
এই চরাচর	৪৩২
চোখ জ্বলছে	৪৫৯
বেলে মাছের খোঁট	৪৭৫
বেলি কেডসের স্মৃতি	৪৯৪
সীমানার নিকট-দূর	৫১৭
ধুলোয় সব মলিন	৫২৪
পেছনের আয়নায় সামনের আয়না	৫৩৪

মশারি

প্রতি রাতে এই হয়, আজও তাই—নড়েচড়েও ঠিক জুত আসে না!

তা জুত আসবে কীভাবে? সিঙ্গল খাটের সঙ্গে তক্তা জোড়া দিয়ে বানানো এই সেমিডাবলের চেয়ে একটু বড়ো খাটে ডাইনে-বাঁয়ে অবাধে নড়াচড়ার সুযোগ কোথায়? তবু একটু কাত হয়ে, চিত হয়ে শোয়া বউর গলা ডাইন বাহুতে জড়িয়ে ধরামাত্রই একটা বেহায়া মশা তার ঘাড়ের গোড়ায় শূল বসায়। নতুন শোনা কোনো কথা বউর কানে ফিসফিসিয়ে বলবে, সে ভেবেছিল; তার বদলে, মশার এমন গা-জ্বলা কামড়ে আপসেই তার ঠোঁট ফাঁক—উহুঁ! দ্রুত হাত ঘুরিয়ে সে মশার গায়ে প্রচণ্ড চড় মারে, কিন্তু শুধুই চড়াৎ শব্দ আক্রান্ত এলাকা অবশ করে, মশা গান গেয়ে কানের পাশ থেকে উড়ে যায়। 'ঘরের মধ্যে ঘর, তার মধ্যে শুয়ে মর'—প্রাইমারিতে পড়ার সময়ে সহপাঠীর মুখে শোনা সেই উত্তর দিতে না-পারা ধাঁধা মনে করে সে এই অন্ধকারে এমন মশার উৎপাত ও আক্রমণজর্জর দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে ভাবে, মরণেও সুখ নেই তা যাব কোয়ানে? কমসে কম ছোটো-মাঝারি-বড়ো মিলিয়ে মোট বারো-চোদ্দোটা ফুটা মশারির সারা অঙ্গে জ্বলজ্বল করছে তো মরণে শান্তি আসবে কোত্থেকে? সারাদিন বাদে বউর গলা ধইরে ভালোমন্দ কয়ডা কথা কবা মশার জ্বালায় সে উপায়ও নেই।

'শুনিচো, ও রুনু, রুনু?' বুক বরাবর ঠেলা দিয়ে বউর সাড়া শোনায় সে ব্যাকুল, অথচ ব্যর্থ এই জন্য যে গর্ভের সন্তানসহ বেচারি ইতোমধ্যে ঘন ঘুমের আলিঙ্গনে।

...

সেই কবে, আট-দশ বছর আগে সে একচান্সে আইএ পাশ করে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে ব্রজলাল কলেজে ভরতি হয়ে বছর দুই পড়েছিল; তখন বন্ধুরা তার সাইফুল নামটাকে ছোটো করে সাইফ বলে ডাকত। সেই পড়া তার আর শেষের মুখ দেখল না, দেখলে কি আজ তাকে স-মিলের চেরা সস্তা তক্তা জোড়া দিয়ে এই খাট সেমিডাবল বানিয়ে শুতে হয়!

ওই ১৯৮২ সালে সে যখন মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ওরফে সাইফ, সেই সময়ে যদি সে রুনুকে ভালোবেসে ঘরছাড়া না-হতো, তবে? রুনুকে নিয়ে ঘরছাড়ার পরই তো বাপ তাকে ত্যাজ্য করল... নিজেদের গুষ্টির শত্রুতা ছেলেপেলের ওপর! ভেবে, সে নিজেই বাপ হচ্ছে ভাবে। তারপর এখানে-ওখানে ঘাটে-বেঘাটে ঘুরে, পেটে একটু ইংরেজি থাকাতে একটা শিপিং করপোরেশনের চাকরি জোটে। সামান্য বেতন, দুজনার ভালোই চলে যেত। কিন্তু মাস ছয়েকের ভেতরে কোম্পানি মোংলায় পোষাল না-বলে চট্টগ্রাম চলে গেলে সে আবারও বেকার হয়ে পড়ে। এ সময়ে হেলাতলার মোড়ে খুলনা শহরের প্রথম আন্তর্জাতিক মানের হোটেল বানানো হলে সেখানে সে ওয়েটারের চাকরি পায়। তবে ওই চাকরিতে তার সামান্যও স্বস্তি ছিল না। ম্যানেজার ছিল শালার খচ্চরের চূড়ান্ত : প্রতি মুহূর্তে উঁচুপদের গোঁয়ার-রোষে তাকে গিলে ফেলতে চাইত। একদিন তো ফরনাথিংই টাকা মারার ক্লেম এলে সে রাগের চোটে লোকটার কলার চেপে ধরলে চাকরি হারায়। শুরু হয় তার মহাদুর্দিন। এমনিতে মিলিটারির সময়, কে কার খোঁজ রাখে, পাত্রে-অপাত্রে তেলাতেলি, ছোটাছুটি, ঘোরাঘুরির পরে সে খুলনা ছেড়ে বাগেরহাটে আসে চাকরির

খোঁজে। তখন কয়েক দিন আগে চালু হওয়া এই দীর্ঘদেহী হোটেলে হঠাৎ করেই ম্যানেজার-ওয়েটার-বাজার করার লোক, এমনকি মাঝেমধ্যে উপরে বোর্ডারদের রুম খুলে দেওয়ার কাজ পায়। এখানে তিন ওয়াক্ত খাওয়া : সকালে গোটা চারেক রুটি লটপটি অথবা গিলা-কলিজার ঝোলে চুবিয়ে, দুপুরে ভাত আর সৌভাগ্য হলে একখানা মাছ জোটে বা ভাঙা ভাঙা কয়েক টুকরো, এর সঙ্গে গাঢ় লাল ঝোল অবশ্য যত চাই পাওয়া যায়; রাত এগারো সাড়ে এগারোটার দিকে সেই দুপুরের পদ দিয়ে খেয়ে দৈনিক বেতন পঁচিশ টাকা হাতে নিয়ে এই ঠ্যাংগা শরীরে চৈত্রের নদীতে গজানো চরের মতো ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে সে ঘরে ফেরে। দিনের খাই-খোরাকিসহ পঁচিশ টাকা একেবারে কম না; হিসাবে সাড়ে সাতশ আসার কথা যদি তিরিশ দিনই শ্রম বেচা যায়। কিন্তু তা তো হয় না। কারণ, সপ্তাহ শেষে একদিন, মাসে মোট চার কি পাঁচ শুক্রবার হোটেল বন্ধ থাকে। ফলে সবে মিলে বেতন ঠেকে ছয়শতে। তা ওই টাকায় শহরের সীমানার দিকে পুরানবাজার-মুনিগঞ্জের মাঝামাঝি মেইন রোডের পাশের উলঙ্গ নর্দমা-লাগোয়া এই বাসের অযোগ্য মুরগির খোপ—যার মেঝে প্রায় লাঙল-চষা ও ফুটো দোচালার কাঠ-বাঁশ-বেড়া-গোলপাতার ভাড়া আর রাত দশটা পর্যন্ত ষাট ওয়াটের একটা বাল্ব জ্বালানো বাবদ একশ পঁচিশ টাকা বস্তির মালিকের হাতে তুলে স্বস্তি! অবশিষ্ট করগোনা টাকায় স্বামী-স্ত্রীর মাসের শেষ পর্যন্ত যেতে জিভ প্রায় বের হয়ে আসে।... এখন যদি টু-ইন-অন স্ত্রীকে আপাতত আত্মীয়স্বজন কারো কাছে রাখা যেত, তা হলে খুঁজেটুজে একটা নতুন চাকরি সে জুটিয়ে নিতে পারত। কিন্তু সে সুযোগ কোথায়? সেই সঙ্গে এই চাকরিতে তো তার মানও থাকে না। তবু কী করা ভেবে সে আপাতত হোটেলের এই চাকরি ছাড়ার চিন্তা কতবার খারিজ করে দিয়েছে। এই এক হপ্তা আগেই তো কোথাকার কোন রামপাল না মোরেলগঞ্জের পা না-ধোয়া খ্যাতের দল তাকে 'তুই' ডেকে বিরায়ানির পিস কত জিগ্যেস করেছিল; আবার, শহরের দাড়িগোঁফ না-ওঠা হাঁটুর বয়েসি ছেলেদের হররোজ ফেনসিডিল খাওয়া দেখে

তার কলকাঠি জমে যায়। তবু পেট বাঁচাতে মগজের রশি আগলে রাখে সে, নয়তো এই হোটেল ছেড়ে কবেই অন্য কোথাও কাজ খুঁজে নিত।

...

কিছুক্ষণ আগে একটা মশা বাঁ-হাঁটুর একটু নিচপাশের হাড় রেখে ডাইনের নরম জায়গায় শূল বসায়, তার সমস্ত শরীরই মশা বসার খবর জেনে পা ঝাঁকুনি দেওয়ার পরও মশাটা না-নড়লে সে দাঁড়া সোজা করে সপাটে হাত ছোড়ে। বেশি রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হওয়া মশা মারলে যা ঘটে—তালুতে ঘন তরল কী যেন লেপা মনে হয়!... প্যান্টের ওপর দিয়েই আক্রমণ নাকি জায়গাটা ছেঁদা? সে ভাবে। সরষেদানা খোঁটার মতো করে প্যান্টের ওপরে হাত বোলায়। না, মশা-বসার জায়গা ছ্যাঁদা না, বিলকুল সুতোর জমিন! পনেরো দিনও হয়নি কেনা এই ফুলপ্যান্ট কাম পাজামা বা ট্রাউজার ছেঁড়া—অসম্ভব! সিরহিন্দ মার্কেটের সুবর্ণা গার্মেন্টসের আয়নায় এই বেগি না পাংক কী সব যেন বলে—মানে এই প্যান্ট পরে তার এক দশক আগের সুরত খুলে গেছিল! আয়নায় দাঁড়িয়ে সে ভেবেছিল : সে বারোয়ারি বংশের সন্তান না! হদ্দরকমের ঢোলা এই প্যান্টের মহুরিও বড়ো, টেনে হাঁটুর উপরে তুললে আসল ব্যাপার তার ধারণায় আসে : ফাঁক দিয়ে মশা ঢুকে কামড়েছে। হাঁটুর নিচের লোম-চুলের ভেতরে মশার কামড়ের জায়গা এতক্ষণে ফুলে ওঠায়, এমন প্যান্টের ভিতর দিয়ে মশায় কামড়ে এই অবস্থা করা মানেই তার অপমান, মশার কাছে পৌরুষ চুরমার! তার এমন প্রায় অস্থিসর্বস্ব দেহের একরত্তি নীলরক্তও কি মাগনা! তা ভেবে অবশ্য নিজের দারিদ্র্যের কাছেই মাথা হেঁট! আর, সঙ্গে সঙ্গে ধূমপানের প্রবল ইচ্ছায় বালিশের তলা থেকে একটা গোপাল বিড়ি বের করে ঠোঁটে রেখে, মাথাটা মশারির বাইরে এনে সে ম্যাচ জ্বালায়। কয়েক মুহূর্ত ঘরবন্দি আঁধার পালাই-পালাই করে ছুটে বেড়ায়।

বিড়িটা শেষ হওয়ার আগে স্থানীয় আনসার ক্যাম্প মসজিদের মুয়াজ্জিন আজান দেওয়ার জন্য বার তিনেক ফুঁ দিয়ে মাইক পরীক্ষা

করে; আর সে কিছুক্ষণ মোড়ামুড়ি করে নিজেকে মশারির বাইরে এনে পরনের প্যান্ট খুলে হাতড়ে হাতড়ে আলনা থেকে লুঙ্গি নিয়ে পরে। এখন পাজামা-গেঞ্জির বদলে নাভির নিচে লুঙ্গি, ঘাড়ে গামছা, মুখে জইতুনের মেসওয়াক, হাতে লাইফবয় সাবান—এই সমস্তসমেত ছাউনি ছাড়া গোসলখানায় ঢুকে স্বল্পালোয় সে যত্নে রাখা বালতির পানিতে নিজের চেহারা দেখে : মাত্তর চার ঘণ্টার ঘুমে চোখ ফোলা, ফোলা চোখে আরও ঘুম চাই, কপালে মশার কৃপায় কতক বিচির আসন, যেন পাতলা-পাতলা সদ্য ওঠা চিকেন পক্সের আঁচড়! নিজের এমন বিচ্ছিরি বদন দর্শন মানে অকাজে সময় নষ্ট। এক-এক মুহূর্ত অতিক্রম মানেই কাজে যাওয়ায়ও দেরি : মালিকের বড়ো চোখের ঝাড়ি খাওয়া—ভেবে সে আবার ঘরে আসে। আরেকটা বিড়ি জ্বালিয়ে, বারান্দা থেকে বদনা নিয়ে নদীর পাড়ে বসানো পায়খানায় যায়। এখানে গু-মুতের উন্মুক্ত মিক্সচারে নাকজ্বলা গন্ধ আর মুহুর্মুহু ধূমটান মিলেমিশে একযোগে বড়োই অসুখকর পরিস্থিতি। এইসঙ্গে বারবার থুতু ফেলা আর ফাঁকা-পেটে বিড়ির ধোঁয়ায় গলা কাঠ, মগজ অসাড়। দাঁড়িয়ে নাভির নিচের লুঙ্গির ভিতর হাত ঢুকিয়ে কুচকির দাদ চুলকাতে চুলকাতে আচমকাই সে জায়গা ছাড়ে। বিড়ি ছুড়ে, বদনা রেখে, গোসলখানায় ঢুকে বাঁ হাতে সাবান দিতে দিতে সে ছালচামড়া খসানো মেঝেয় গোড়ালি ঘষে। ডাইন হাত মুখে ভরে জিভ রগড়ায়, মধ্যমায় দাঁত ঘষে, গলায় আঙুল ঢুকিয়ে জোরে খাঁকারি দেয়, এবং কুলকুচি করে কণ্ঠার ময়লা দূর করে। গায়ে পানি ঢেলে, গা-র চামড়া নেতিয়ে লাইফবয় সাবানের বিজ্ঞাপনমাফিক ঘষা-মাজা—দেখে মনে হয় ফেনায় জড়ানো মূর্তি! দ্রুত গোসল শেষ করে নিগড়ানো গামছা ঝাড়তে ঝাড়তে ঘরে ঢুকে এখন এই প্রায় সূর্য উঠি উঠি সকালে বউকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে। গেঞ্জির ওপর জামা, জাঙ্গিয়ার ওপর একটু আগের খুলে রাখা প্যান্ট আর প্যান্টের মুখে জামার তলভাগ মুড়ে দিয়ে ইন করে। চিরুনি হাতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আয়েশি ভঙ্গিতে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ভাবে, যা দেহাতিচে না! ঠিক ফুলবাবু! এই ভাবায় সমস্ত

ঘরে যেন তার হাসি হোলি খেলে। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ওপরে মশার কামড় দেখে সেই হাসি মিলিয়েও যায়!

এবার চা বানানোর জন্য কেটলিতে পানি দেওয়া, কুকার জ্বালানো—এই জন্য বউকে ডাকা দরকার ভেবে সে ঘরের পুবদিকের জানালা খুলে দেয়। কুসুম রোদের জেল্লায় বউর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তামা রঙের বাহুতে আলো হামাগুড়ি দেয়। বউর গায়ে দেওয়া পাতলা কাঁথা টেনে সরায়, এতে তার অবিন্যস্ত শাড়ি হাঁটুর উপরে উঠে যায়; গায়ে ব্লাউজ না-থাকায় খোলা স্ফীত মাই দুটোও নড়ে ওঠে। ঝুঁকে সে বউর গায়ে হাত দিয়ে নাড়াতেই মুহূর্তে তার চোখ কপালে ওঠে! পোয়াতি বউর মুখ আর আসন্ন সন্তানের খাওয়ার জন্য বড়ো হয়ে যাওয়া স্তনের ওপরে মশার এমন আক্রমণ; ভোরের আলোয় তা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে! 'ও রুনু, রুনু!' রুনুর গায়ে নাড়া দেওয়ার পরে, সে নড়েচড়ে আড়মোড়া ভেঙে, 'ও-ও' হাপসি ছেড়ে, তার দিকে 'কী' জিগ্যেস করে উঠে বসে। এরপর আর কোনো কথা না-বলে শয্যা ছাড়ে। এই মাস সাতেক হয় ডাকবাংলো রোডের চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞ জনৈক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের পরামর্শ পালন করে বউর সব সময়ে খাই খাই ভাব, যখন যা মেলে শাক-পাতা বা কুঁচড়ো মাছ খেয়ে বউ তার ইদানীং যথেষ্টই তাগদ-তাগড়া, অনায়াসেই মাতৃমঙ্গল ও শিশু সদনের সুস্থ গর্ভবতীর তালিকায় ঢোকার দাবি রাখে।

তার নজর ফেরে কোনো টুকটাক শব্দে। দেখে, রুনু চোখে-মুখে পানি দিয়ে এসেই কেটলির ভেতরে গুঁড়ো চা ফেলে তা দুটো এনামেল কাপে ছাঁকতে শুরু করেছে। এক গ্লাস পানিসহ দুটোর একটা কাপ তার হাতে দিলে, সে পানি না-খেয়েই কাপের কোনায় ঠোঁট দিয়ে সুরুৎ করে চা টেনে, স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে, ঘাড় তুলে রুনুর কাছে বিস্ময়ের চোখে মুখ খোলে, 'তোমার মুহিবুহি [মুখে-বুকে] দেখলাম মশা জম্মের মতন কামড়াইচে!'

'হঅ, চুলকোতিচে।'

'নাহের বারেন্দায় ডেরেন, মাজেমদ্যি পৌরসভা এট্টু ওষুদ ছিটলি পারে—তা করবে নানে।'